

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

খন্দকার সিরাজুল হক

নজরুল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাংলা ভাষার একজন খ্যাতিমান সাহিত্য শিল্পী। কবিতা ও গানে তাঁর প্রতিভা চূড়া স্পর্শ করেছে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাতেও তাঁর পদচারণা নিরর্থক হয় নি। নজরুল তাঁর সৃষ্টিমুখর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কল্যাণকামনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাই এ-দেশের গণচিত্তকে স্পর্শ করতে তাঁর বেশী সময় লাগে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের অস্তিমলগ্ন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপরিধিতে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা যে ভাবে পরাধীন দেশবাসী ও বিদেশী শাসক গোষ্ঠীকে আলোড়িত করেছিল, তা তুলনারহিত। 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বে তাঁর প্রত্যয় ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই 'মানুষের কবি'। তাই দ্বিধাহীনভাবে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন:

নর্তমানের কবি আমি তাই, ভবিষ্যতের নই নবী,

কবি ও অবকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।

* * * * *

পরোয়া করিনা, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের ছত্রুণ কেটে গেলে,

মাথার ওপরে ছুগিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

প্রার্থনা বরো-যারা ক্ষেড়ে খায় তেত্রিশ কেটি মুখের গ্রাস

যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।”^১

এ-ই কবি নজরুল, যিনি যশ ও খ্যাতির পরোয়া কোনদিনও করেন নি। মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির জন্য তিনি তাঁর লেখনীকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে: তা তরবারীর থেকেও ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই ক্ষুরধার লেখনীকে তরু করার জন্য তাঁর গ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করেছে, তাঁকে নিষ্ফেপ করেছে কারাগারে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিবৃত্ত করা যায় নি। দেশবাসীর মুক্তির এই আতাত্তিক কামনা থেকেই তাঁর রাজনীতির মঞ্চ এবং সংবাদপত্রের জগতে পদার্পণ ঘটেছিল। লেখক হিসেবে নজরুল কলকাতা ও ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও তাঁর সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকা ছিল তিনটি—‘নবযুগ’, ‘ধূমকেতু’ ও ‘লাঙ্গল’।

দুই

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত আন্দোলনের যুক্ত নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬৩) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের (১৮৮৯-১৯৭৩) যুগ্ম সম্পাদনায় ২০ “ইসিও×২৬” ইঞ্চি আকারের সাক্ষ্য দৈনিক ‘দৈনিক নবযুগ’-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে।^২ প্রকাশ-স্থান ৬নং টার্নার স্ট্রীটে অবস্থিত ফজলুল হক সাহেবের বাসার নিচের তলা। পত্রিকা প্রকাশনায় ফজলুল হক সেলবর্সী (১৮৯৩-১৯৬৮), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) ও মঈন উদ্দীন হোসায়ন সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতেন।

সাহিত্যিকী

‘নবযুগ’ প্রথম থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল নজরুলের কলমের গুণেই। নজরুলের সাংবাদিকতার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও মৌলিক প্রতিভার গুণেই তিনি বড় বড় সংবাদকে সুন্দর শিরোনাম দিয়ে সংক্ষেপে পরিবেশন করতে পারতেন। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় এ-সম্পর্কে বলেছেন:

নজরুল ইসলাম কোনো দিন কোনো দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকে নি। তবুও সে বড় বড় সংবাদ গুলি পড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলেতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপন করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হিমশিম খেয়ে যান। তারপরে নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যেও ‘নবযুগ’ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেই সব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়ে নি।^৭ যেমন রবীন্দ্রনাথের সু-পরিচিত গান-” আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরান সখা বন্ধু হে আমার ॥”-এর অনুসরণে ইরাকের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সল (১৮৮৫-১৯৩৩) সম্পর্কিত একটি সংবাদের তিনি শিরোনাম দিয়েছিলেন: “আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরানসখা ফৈসুল হে আমার”।

‘নবযুগ’-এ নজরুল যে সম্পাদকীয় লিখতেন তা ছিল দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এবং বৃটিশ সরকারের স্বার্থবিরোধী। তাই সরকার এ-ধরনের লেখার জন্য পত্রিকার সম্পাদককে কয়েকবার সতর্ক করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খেলাফৎ কমিটির একটি ইশতেহার ছাপানোকে উপলক্ষ করে সরকার পত্রিকার এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে। ফলে পত্রিকাটি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে দু’হাজার টাকা জমা দিয়ে আবার পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নেয়া হয়। নজরুল এ-পত্রিকার সঙ্গে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।^৮

‘নবযুগ’-এ প্রকাশিত নজরুলের একুশটি সম্পাদকীয় নিয়ে ১৯২২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে ‘যুগবাণী’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশের কিছুদিন পরেই (২৩ নভেম্বর ১৯২২) গ্রন্থটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এটিই নজরুলের প্রথম বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ।^৯ নজরুল নিজেই ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেন (কলিকাতা) থেকে ‘যুগবাণী’ প্রকাশ করেছিলেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হলে এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ‘নবযুগ’-এর অন্যতম কর্মী মঈন উদ্দীন হোসায়ন তাঁর প্রকাশনা-সংস্থা ‘নূর লাইব্রেরী’ থেকে ১৯৪৯ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬) সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের ‘প্রকাশকের নিবেদন’-এ বলা হয়েছে: “প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক গভর্নমেন্টের অত্যাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি নজরুল ইসলাম অধুনালুপ্ত দৈনিক ‘নবযুগ’ের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে সব প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধক্রমে তাহার কতকগুলি ‘যুগবাণী’ নামে

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। তদানীন্তন বৈদেশিক গভর্নমেন্ট এই সব লেখার প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অনতিবিলম্বে ইহার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। বহু আন্দোলনের পর বর্তমান গভর্নমেন্ট এই পুস্তকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় কবির জন্মদিনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।” ‘যুগবাণী’ গ্রন্থের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে।

রাজনীতিবিদ এ.কে.ফজলুল হক ‘নবযুগ’ পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে পত্রিকার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে পত্রিকার দু’জন সম্পাদককে কোন নির্দেশ দেন নি, তিনি ‘নবযুগ’ প্রকাশের জন্য আর্থিক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন মাত্র। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যেহেতু নজরুল ও মুজিবুর আহমদ, তাই তাঁদের চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলন এ-পত্রিকায় ভালো ভাবেই ঘটেছিল। এ-প্রসঙ্গে নজরুলের অন্যতম সুহৃদ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

সাক্ষ্য দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকার আমলে বাংলা দেশের তৎকালীন পত্রিকাদিতে যে-সব রচনা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল তার মধ্যে একটু গতানুগতিকতা দোষ দেখা যেত। কেউ কোন কিছু নতুন করে ভেবে সমাজ চেতনাকে নতুন পন্থা দেখাতে সাহস করত না। কিন্তু মুজিবুর আহমদ ও নজরুল হক সাহেবের দৃষ্টিকে দেশের সাধারণতম অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রেরণা দেন চাষী ও মজুরের সংবাদ সরবরাহ করে। সংবাদপত্রে চাষী ও মজুরের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশের গৌরব এই ‘নবযুগ’-এরই প্রাপ্য।^{১৭}

প্রথম পর্যায়ের ‘নবযুগ’ ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দুই যুগ পরে নবপর্যায়ে ‘নবযুগ’ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।^{১৮} এ-পত্রিকারও সম্পাদনার দায়িত্ব নজরুলের ওপর অর্পিত হয়েছিল। নজরুল এ-সময়ে শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তাই সম্পাদনা কর্মে তাঁর পূর্বেই সক্রিয়তা বজায় ছিল না। মাঝে মাঝেই তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন।^{১৯} পত্রিকা-সম্পাদনার অনেক বজাই আবুল মনসুর আহমদকে (১৮৯৭-১৯৭৯) পালন করতে হতো। একারণেই তিনি নজরুলকে ‘বেনামী সম্পাদক’ বলে অভিহিত করেছেন।^{২০} কিন্তু বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, নজরুল তাঁর সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করতেন।

তিন

‘নবযুগ’ বন্ধ হয়ে যাবার পর নজরুল নিজেই পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু অর্থভাবের কারণে সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। এ সময়ে (জুন-১৯২২) মওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) আমন্ত্রণে তিনি ‘দৈনিক সেবক’-এর সম্পাদকীয় বিভাগে এসে যোগ দিলেন। কিন্তু মওলানার পত্রিকায় স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) মৃত্যু (২৫ জুন) উপলক্ষে তাঁর রচিত সম্পাদকীয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে ‘সেবক’-এ প্রকাশিত হলে তিনি এ-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন।^{২১}

সাহিত্যিকতা

নজরুল নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবছিলেন, তাই মুজফ্ফর আহমদের পরিচিত জনৈক হাফেজ মসউদ আহমদ তাঁর কাছে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা বললে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু মসউদ আহমদ মুজফ্ফর আহমদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েই নজরুলের কাছে এসেছিলেন। নজরুল সেকথা জানতেন না। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় এ-ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

মসউদ আহমদ আমার নিকটে একটি প্রস্তাব করল যে একশানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা সে খর করতে চায় এবং তার লেখার ও চালাবার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। কাগজখানা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক কাগজ হবে এ-কথাও সে আমায় বলল। খবরটা ওমর যে 'সোশ্যালিজম'র খানিকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতেও সে ভুলল না। সব শুনে আমি তাকে জিজ্ঞাস্য করলাম টাকার কি ব্যবস্থা হবে? সে জানাল যে আড়াইশ টাকা সে জোগাড় করেছে। সঙ্গেই সঙ্গেই আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিলাম! আমি তাকে বলে দিলাম যে আড়াইশ টাকা মাত্র হাতে নিয়ে কাগজ খর করতে যাওয়া হঠকারি ভা হবে। মনে হলো সে হতাশ হয়ে চলে গেল। আসলে সে কিন্তু হতাশ হয় নি। আমি তার প্রস্তাব নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সোজা কাজী নজরুল ইসলামের নিকটে চলে গেল এবং একই প্রস্তাব তার নিকটেও করল। 'সেবক'-এ নজরুল সুখী ছিল না। কাজেই, মসউদ আহমদের প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।^{১১}

'সেবক'-এ তিনি সুখী ছিলেন না এবং সে-সময়ে তিনি 'সেবক'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাই একটি পত্রিকা প্রকাশের আত্মত্বিক বাসনায় তিনি অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই মসউদ আহমদ সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনেই রাজী হয়ে যান। পরে জানা যায় মসউদ আহমদ ছিলেন পুলিশের নিয়োজিত চর।^{১২} তার মাধ্যমে পুলিশ মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুলের খবর নেবার ব্যবস্থা করেছিল।

বাহ্যিক সাপ্তাহিক নয়, অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপেই একটি পত্রিকা নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো। নজরুল পত্রিকাটির নাম দিলেন 'ধূমকেতু'। "সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে।"-এই ঘোষণা দিয়েই 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট (২৬ শ্রাবণ ১৩২৯) শুক্রবারে।^{১৩} প্রথম সাতটি সংখ্যার নজরুলের নাম 'সম্পাদক' হিসেবেই ছাপা হয়েছিল। অষ্টম সংখ্যা থেকে 'সম্পাদক' শব্দের পরিবর্তে 'সারথি' ব্যবহৃত হয়। এ-পত্রিকার কর্মসচিব বা ম্যানেজার ছিলেন শ্রী শান্তিপদ সিংহ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আফজাল-উল হক। পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠার আকার ছিল ক্রাউন ফোলিও সাইজ অর্থাৎ ১৫"×১০"। কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা এবং বার্ষিক চাঁদার হার পাঁচ টাকা। প্রথমে পত্রিকার আফিস ছিল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে, পরে তা স্থানান্তরিত হয় ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে।

'ধূমকেতু'র মোট বত্রিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে নজরুলের সম্পাদনায় প্রথম একুশটি সংখ্যা বের হয়। দ্বাবিংশ সংখ্যা থেকে 'সারথি' হিসেবে

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

অমরেশ কাজীলালের নাম ছাপা হতে থাকে। মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবেও তাঁর নাম এ-সময় থেকে ছাপা হয়। নজরুলের নাম এ সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা (৩২শ সংখ্যা) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা রূপে যুক্ত ছিল। ‘ধূমকেতু’র শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে (১৩ মাঘ ১৩২৯)। এ-সংখ্যাই ‘নজরুল সংখ্যা’ চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ-সংখ্যার “ধূমকেতুর গ্রহণ” শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছেঃ

ধূমকেতুর সারথি, প্রতিষ্ঠাতা, উদ্ভাস, উদ্ভাস প্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম ব্যারোক্রেসীর ব্যবস্থার রাজদ্রোহ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এক বছরের জন্য কার্টন কারাদণ্ডে নড়িত হয়েছেন। কাজী নজরুল সম্বন্ধে অন্য সংবাদপত্রে কিছু কিছু সংবাদ বেরিয়েছে কিন্তু আমরা তাঁর মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকায় ধূমকেতু বার করতে না পারায় বিশেষতঃ মোকদ্দমার ফলাফল না জানা পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয় বিবেচনা করে বিশেষ কোন কথা বলিনি। আগ্র কয়েকদিনের মেঘ, বাদল, বরষা, বজ্র ফুঁড়ে ‘ধূমকেতু’ আবার আপনাদের সামনে উনয় হোল শুধু তাঁরই কথা নিয়ে।^{১৬}

‘ধূমকেতু’ প্রকাশের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) সহ অনেকেই আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত আশীর্বাণী শিরে ধারণ করেই ‘ধূমকেতু’র প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলঙ্কারে তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর^{১৭}

‘ধূমকেতু’র উদ্দেশ্য সম্পর্কে নজরুল প্রথম সংখ্যায় “সারথির পথের খবর” শিরোনামে ঘোষণা করেছিলেন :

মা ভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ‘জয় প্রলয়ঙ্কর’ বলে ‘ধূমকেতু’কে রপ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমি প্রথমে আমার যাত্রা শুরু করার আগে আমার সত্যকে সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি।.....দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভডামি, মেকি তা সব দূর করতে ‘ধূমকেতু’ হবে আগুনের সম্মার্জনী!.....‘ধূমকেতু’ কোন সাম্প্রদায়িক রূপান্তর নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

সাহিত্যিকী

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি বেগনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

নজরুলের বিখ্যাত ‘ধূমকেতু’ কবিতাটি এ-সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি পরে ‘অগ্নি-বীণা, কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর ‘বিদ্রোহী কবিতার অংশ বিশেষও এ-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নজরুল ছিলেন আপসহীন। তাই ‘ধূমকেতু’র পাতায় সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। ১৯২২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় (১ম বর্ষ-১৩শ সংখ্যা, ২৬ আশ্বিন ১৩২৯, শুক্রবার) তিনি “ধূমকেতুর পথ” শিরোনামে লিখেছিলেনঃ

- অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, ‘ধূমকেতু’র পথ কি? সে কী বলতে চায়? এর দিয়ে কোন মঙ্গল আসবে ইত্যাদি। নীচে মোটামুটি ‘ধূমকেতু’র পথ নির্দেশ করছি।.....সর্ব প্রথম ‘ধূমকেতু’ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী বরবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লী করে দেশকে শাসান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাতভাড়ি ওটিয়ে, বোচকা-পুটলি বেধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুরক্ষি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুসুখটুকুকে দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সবল কিছু নিয়ম-কানুন বাদন শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।.....মানুষের এমনই দুর্বলতা যে, শৃঙ্খলা প্রশংসা পাওয়ার লোভটুকুকে কিছুতেই সে জয় করতে পারছে না। সমাজে থেকে সমাজের শৃঙ্খলা লাভের জন্য তাকে জেনে শুনে অনেক মিথ্যা আচরণ করতে হয়। ‘ধূমকেতু’ এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে, দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায়, অন্তত তারা যেন সর্বাস্থে এই দুর্বলতা, এই লোভটুকু জয় করার ক্ষমতা অর্জন করে তবে কোনো কাজে নামে। সত্যিকার প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তাতে কাজ পড়ই হয় বেশি।....সত্যকে জাগ্রাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শৃঙ্খলা-প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।

নজরুল তাঁর এই পত্রিকায় প্রেরণা-উদ্দীপক সম্পাদকীয় ছাড়াও লিখতেন কবিতা ও মতামত। মতামতের তিনটি পর্যায়ে ছিল-“দেশের খবর”, “পরদেশ পঞ্জী” ও “মুসলিম জাহান”। নজরুল এই মতামত পর্যায়ে লেখাগুলোকে কৌতুককর ভঙ্গীতে পরিবেশন করতেন। নজরুলের সম্পাদনার গুণে ‘ধূমকেতু’ অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তার বিবরণ মুজফ্ফর আহমদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪),

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নজরুল-সুহৃদ তাঁদের রচনায় দিয়েছেন।^{১৬} পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকা-বিত্তময়ের বিবরণ দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

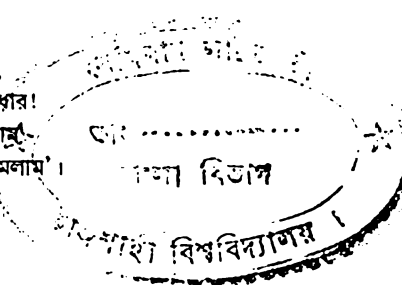
ঘন্টা দু'য়ের মধ্যে দু'হাজার কাগজ উবে গেল। হকারের দল এসে হাজির হল ছাপাখানায়, বত্রিশ নম্বরে—আরো কাগজ চাই। চার-পাঁচ হাজার ছেপে দিলেও তারা তখনই তা নিয়ে নিতে রাজী।.....বিক্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বের করার আগেই হকার আগাম দাম দান দিয়ে যায়। কাগজ বের করার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে ভরণের দল ছটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাড়িল। তারপর হড়োহড়ি কাড়াবাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক রূপ কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা গরম গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হুটলে, রোয়াকে, বৈঠক খানায়, তার পরদিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে— 'ধূমকেতু'। জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি এমন করে ধাক্কা মেরে চলে 'ধূমকেতু' যে রাজশক্তি প্রমাদ গণে।

যে দুটি লেখার জন্য সরকার 'ধূমকেতু' বাজেয়াপ্ত করেছিল তার একটি স্বয়ং নজরুলের লেখা কবিতা “আনন্দময়ীর আগমনে”, যা ‘ধূমকেতু’র “আগমনী সংখ্যায়” (১২শ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যটি অব্যাপক সাতকড়ি মিত্রের এগার বছরের ছোট বোন শ্রী লীলা মিত্রের “বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ” শীর্ষক কথিকা, যা প্রকাশিত হয়েছিল ‘ধূমকেতু’র “দেওয়ালী সংখ্যায়” (১৫শ সংখ্যা, ২০ অক্টোবর, ১৯২২)। “আনন্দময়ীর আগমনে” কবিতাটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিওদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দীপান্তরে
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?
* * * * *

পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুপলি খেয়ে ভরায় উদর,
টিবটিবি হয়, বিষ্টা কি নাই, ছিছি এদের খাদ্য ক্ষুধার!
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাধরু-
লাধি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর, মলাম-মলাম'।
* * * * *

হঠাৎ কখন উঠলো ক্ষেপে বিদ্রোহিনী ঝালি-রাণী,
ক্ষাপা মেয়ের অভিনানেও এলিনে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা?
পাষণ বাপের পাষণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভূজা!



সাহিত্যিকী

“বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ” কথিকায় লীলা মিত্র বলেঃ “আজ একদল পরম হিতৈষী (!) রাজপ্রেমিক লোকদের দেখা যায়, যাদের কোনো কিছু বললেই বলেন, ইংরাজ আমাদের কি করেছে? এসব শুধু তোমাদের পাগলামী। তাঁদের এই আশ্চর্য নির্লজ্জ প্রশ্নের উত্তর দিতে সত্য সত্যই অবাক হতে হয়। অধঃপতনের আর কি বাকী আছে! এই ত সবে সন্দেহ। তাঁদের কথায় বড় দুঃখেও হাসি আসে। কথায় আছে “প্রেম অন্ধ”। তাঁরাও বোধ করি ইংরাজ প্রেমে অন্ধ। যাদের সুমুখ দিয়ে জালিয়ান ওয়ালা বাগের বীভৎস অত্যাচার প্রভৃতি কাণ্ড হয়ে গেল তাঁরাও বলেন, “হয়েছে কি?”

এ-দুটি লেখার জন্যে পুলিশ ৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে অবস্থিত ‘ধূমকেতু’ অফিসে আসে তল্লাসীর পরওয়ানা ও নজরুলের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে। নজরুল এ-সময়ে অফিসে ছিলেন না, বিহারের সমস্তিপুরে গিয়েছিলেন। তখন সমস্তিপুরে গিরিবালা দেবী সকন্যা তাঁর ভাইদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ‘ধূমকেতু’র ১৭ই নভেম্বরের সংখ্যায় (২২শ সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) নজরুলের গ্রেপ্তারের খবর “ধূমকেতুর গ্রহণ” শিরোনামে প্রকাশিত হয়ঃ

গত ৮ই নভেম্বর সকাল বেলা লাল বাজারের গ্রহ ধূমকেতু কেন্দ্রে উদয় হয়েছিলেন। একই সময়ে আর একদল প্রেসেও দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরা কাজী নজরুল ইসলামকে চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকায় দেওয়ালী (১৬শ) এবং আগমনী (১২শ) সংখ্যার সব কাগজ, চিঠিপত্র ও হিসেব ইত্যাদি নিয়ে যান। সবে “গ্রহণ লাগা” শুরু হোল।

নজরুল এ-সময় সমস্তিপুর থেকে কুমিল্লায় চলে যান। এখানেই তিনি ২৩শে নভেম্বর তারিখে বেলা বারোটায় গ্রেপ্তার হন। এ-খবর ২৪শে নভেম্বরের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ এবং ২৮শে নভেম্বরের ‘ধূমকেতু’তে প্রকাশিত হয়েছিল।^{১৭}

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হোর আদালতে নজরুলের বিচার হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী মলিন মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে নজরুলের মামলা পরিচালনা করেন। ইংরেজ বিচারক সুইন হো ১৯২৩ সালের ১৬ ই জানুয়ারীতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।^{১৮} নজরুল এ-মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন (৭ জানুয়ারী ১৯২৩) তা তাঁর উকিলের মনঃপূত না হলেও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।^{১৯} এই বিখ্যাত ‘জবানবন্দী’টি ‘ধূমকেতু’র শেষ সংখ্যায় (৩২শ সংখ্যা, “নজরুল-সংখ্যা”, ২৭ জানুয়ারী ১৯২৩; ১৩ মাঘ ১৯২৯) “রাজবন্দীর জবানবন্দী” শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ‘প্রবর্তক’-এর মাঘ সংখ্যায় এবং ‘উপাসনা’ ও ‘সহচর’-এর ফাল্গুন সংখ্যায় ‘জবানবন্দী’টি পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল। পুস্তিকা

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

আকারেও এর দুটি সংস্করণ প্রকাশ লাভ করে। নজরুলের এই বিখ্যাত ‘জবান বন্দী’টির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকরাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।....

আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজ বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে-বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দ্বারা তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাক্য, সত্য-স্বরূপ।.....

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি—কাহারো ভোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারের পিছনে পৌঁছাই নাই,—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্বেষ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুই নিয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।.....

আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ—পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধুমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দহন করবে।.....

নজরুল ইসলাম-ধর্মের সাম্যচেতনা এবং ভাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী হলেও প্যান ইসলামবাদের সমর্থক ছিলেন না। এ-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে কামালপহী। মোস্তফা কামালের (১৯৮১-১৯৩৮) প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত হয়েই তিনি “কামাল পাশা” কবিতাটি রচনা করেছিলেন, যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার ‘মোসলেম ভারত’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির কিয়দংশ ‘ধূমকেতু’র ৮ম সংখ্যায় (২৬ ভাদ্র, ১৩২৯) সংকলিত হয়েছিল। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় খবর পরিবেশন করতে গিয়ে খেলাফত আন্দোলনের প্রতি নজরুলের বিরূপতা অপ্রকাশিত থাকেনি। গয়াতে নিখিল ভারত খেলাফত অধিবেশন হবে জানতে পেরে ‘ধূমকেতু’র ১৩শ সংখ্যায় (১৩ অক্টোবর, ১৯২২; ২৬ আশ্বিন ১৩২৯) “দেশের খবর” অংশে নজরুল নিম্নরূপ শিরোনাম দিয়ে খবর পরিবেশন করেছিলেন :

নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্স এবার গয়া।

দ্বিঃ হয়েছ আগামী ডিসেম্বর গয়াতে নিখিল ভারত কনফারেন্সের অধিবেশন হবে।.....কিন্তু গয়া জায়গাটিতে লোকে পিতৃপুরুষের পিণ্ডি দান করতেই যায় শুনেছি। খিলাফত কি এবার

সাহিত্যিকী

তার মৃত নন জায়োলেপ গোষ্ঠীর পিডি দেবে, না গয়াপ্রাপ্তি ঘটাবে? আমাদের বিবেচনায় এটা তবে মঙ্গায় হওয়াই উচিত ছিল, সেখানেই অক্সা পেত সেটা।

নজরুলের মতো একজন মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতি-সচেতন, স্বাধীনচেতা সাহিত্যিক ‘ধূমকেতু’র সম্পাদক ছিলেন বলেই এ-পত্রিকার সহযোগী ও লেখকরূপে একে একে এসে সমবেত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), প্রিয়দর্শনা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৮৭-১৯৮৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮০-১৯৬৩), মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), প্রেমাদ্রুর আতর্ষী (১৮৯০-১৯৬৪), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪), শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৩-১৯৭৩), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), নরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

‘ধূমকেতু’ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে বৃটিশ বিরোধী চেতনাকে উজ্জীবিত করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়া। ‘ধূমকেতু’ দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু ‘অর্ধচেতন’ দেশবাসীকে চমক মেরে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

‘নবপর্যায় ধূমকেতু’ প্রকাশলাভ করেছিল এই ‘ধূমকেতু’র প্রায় দশ বছর পরে ১৯৩১ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে সাপ্তাহিকরূপে। সম্পাদক ছিলেন শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক। পত্রিকাটি ‘কাজী নজরুল ইসলাম প্রবর্তিত ও পরিচালিত’-শিরোভূষণ করে প্রকাশিত হলেও কার্যত সম্পাদক বা পরিচালক হিসেবে এর সঙ্গে নজরুলের কোন যোগ ছিল না। তিনি পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে “ধূমকেতুর আদি উদয় ‘মুহুর্তি’ নামে একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, যা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পরে আরো কয়েকটি লেখা তিনি প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন।

চার

১৯২৫ সালের পয়লা নভেম্বর তারিখে কাজী নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দীন হুসয়ন প্রমুখ রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে ‘দি লেবার-স্বরাজ পার্টি অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবী স্বরাজ পার্টি) নামে বলকাতায় একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় দলটিকে বলা হতো ‘ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক প্রজা-স্বরাজ দল’। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডের একটি বোর্ডিং হাউসের বাড়ীর দেতলার দু’খানা ঘর ভাড়া নিয়ে পার্টির অফিস গড়ে উঠেছিল।^{২০} লেবার-স্বরাজ-পার্টির প্রথম গঠন প্রণালী, কর্মসূচী ও আদর্শ পয়লা নভেম্বর (১৯২৫) তারিখেই নজরুলের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ, ১৩৩২) তারিখে এই পার্টিরই মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক ‘লাঙল’ প্রকাশিত হয়।^{২১} ‘লাঙল’ এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৫) নজরুল স্বাক্ষরিত পার্টির দলিলগুলো প্রকাশিত হয়েছিল।^{২২} ‘লাঙল’ পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন তাঁর বাঙালি পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার কর্মধ্যক্ষ ছিলেন কমরেড আবদুল

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

হালীমের জ্যেষ্ঠ সহোদর শামসুদ্দীন হুসয়ন। ‘লাঙল’-এর পরিচয় দিতে গিয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪) তাঁর স্মৃতিবন্ধায় লিখেছেনঃ “একদিন বর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কয়ার-মুখে চলেছি, হ্যারিসন রোড আর বর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কোণে ফিরিওয়ালাদের হাতে একটি নতুন কাগজ নজরে পড়ল। পত্রিকাটির নাম ‘লাঙল’। নতুন ধরনের নামটি লাগল ভালো। পত্রিকাটি নিয়ে বাড়ি ফিরলুম, পড়ে দেখলুম যে শ্রমিক কৃষক দলের নাম দিয়ে একটি দল সৃষ্টি হয়েছে, সেই দলেরই মুখপত্র হচ্ছে ‘লাঙল’। তখন চিঠি লিখলুম ‘লাঙল’র অফিসের ঠিকানায়। দলের তরফ থেকে শামসুদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় এলেন। তার দু’-তিন দিন বাদেই আমি হাজির হলুম গিয়ে ‘লাঙল’র অফিসে। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দুটি ঘর নিয়ে শ্রমিক কৃষক দলের ও ‘লাঙল’র অফিস ছিল। মনে আছে সেই বিকেল বেলাটা আমি গিয়ে হাজির হলুম সেখানে। তখন আমার খালি পা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে খন্দর। ঘরের মধ্যে এক ছোট মানুষ বসে ছিলেন, শরীর তাঁর কৃশ, মুখ বিবর্ণ। শামসুদ্দীন সাহেব আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হচ্ছেন মুজফ্ফর আহমদ।....দু’-তিন দিন বাদে আবার গেলুম ‘লাঙল’ অফিসে, সেদিন হেমন্ত সরকার আর নজরুল ইসলাম, এই দু’জনের সঙ্গে আলাপ হল সেখানে।.....নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সে কবিতা পড়ল, গান গেয়ে শোনালো। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিল নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে।.....‘লাঙলে’ বের হল নজরুলের “নারী” কবিতাটি। একদিনের মধ্যে ‘লাঙল’ সব বিক্রি হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হোল। নজরুলের কবিতাই ছিল ‘লাঙল’র প্রধান আকর্ষণ। যে-সব প্রবন্ধ ছাপা হত সেগুলোর মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের ছোওয়া কিছু কিছু থাকলেও উগ্র জাতীয়তাবাদেই ঠাসা থাকত প্রবন্ধগুলি।.....রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে ‘লাঙল’র জন্যে আশীর্বচন জোগাড় করবার ভাড়া পড়ল আমার উপর। একদিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেনঃ

জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, উদ্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।”

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বচনটি ‘লাঙল’-এর এয়োদশ সংখ্যায় (২৫ মার্চ, ১৯২৬) ছাপা হয়েছিল। ‘লাঙল’-এর প্রথম সংখ্যাই ছিল “বিশেষ সংখ্যা”। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয়তে নজরুল ঘোষণা করেনঃ “যেখানে দিন দুপুরে ফিরিওয়ালি মাথায় করে মাটি বিক্রি করে, সেই আজব শহর কলিকাতায় ‘লাঙল’ চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সবলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু সেই পাষণ শহরেই আমরা ‘লাঙল’ নিয়ে বেরুলাম। এই পাষণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই।...‘লাঙল’ চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন, সেই জনক আমাদের গুরু। যিনি Producer (জনক) তিনিই ঋষি। তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নবজন্মের নূতন-দর্শনে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। Distributor হিসাবে জন কয়েক উদ্যোগের স্থান সমাজে আছে। ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবা করার জন্যও লোকের প্রয়োজন। কবি, চিত্রকর, শিল্পী হিসাবেও শ্রুতির স্থান আছে। কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে

সাহিত্যিকী

খাওয়ার ব্যবসাতা লোপ পাওয়া দরকার। শরীরের মধ্যস্থল বেশি স্ফীত হয়ে গেলে শরীরটাই অচল হয়ে পড়বে। দুধার লেজ শরীর অপেক্ষা বড় হলে তখন লেজের মাংস খেলে দুধারই উপকার।.....ব্রাহ্মণ-পাদরির রাজস্ব গিয়েছে। গুরু- পুরোহিত, খলিফা, পোপ নিবাংশ প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বংসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজন শূদ্র নয়—শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান আরম্ভ করলাম। লাঙল নবযুগের নব-দেবতা। জয় লাঙলের জয়—জয় লাঙলের দেবতার জয় ॥”

নজরুলের এই সম্পাদকীয় থেকে তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতার গতিধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক হলেও কংগ্রেসের নরম পছন্দ ও আপোষনীতি তাঁর মনঃপূত ছিল না। নজরুল চেয়েছিলেন দেশের রাজনীতি মধ্যবিত্তের গণী অতিক্রম করে কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে উঠুক। তাই ‘লাঙল’-এর প্রথম সংখ্যাতেই ‘সাম্যবাদী’ কবিতাওচ্ছ প্রকাশ করেছিলেন। এ-কবিতায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন :

আসিতেছে শুভ দিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু’পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিত হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তরাই মানুষ, তরাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি কথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উপান।
(কুলি-মজুর)

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘সাম্যবাদী’ পুস্তিকা-আকারে (৩২ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়। এ-পুস্তিকায় এগারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল : সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারান্দা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য ও কুলি-মজুর। ‘সাম্যবাদী’ পরবর্তীকালে ‘সর্বহারা’ (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। “কৃষকের গান” কবিতাটি ‘লাঙল’-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (৮ পৌষ, ১৩৩২) প্রকাশিত হয়। “শ্রমিকের গান” কবিতাটি প্রকাশিত হয় ৬ই ফাল্গুনের (১৩৩২) সংখ্যায়। ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (২৩ মাঘ, ১৩৩২) কৃষ্ণনগরে লেবার-স্বরাজ পার্টির সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নজরুল উদ্বোধনী সংগীতরূপে “শ্রমিকের গান” গেয়েছিলেন। ‘লাঙল’-এর ৪ঠা চৈত্র (১৩৩২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় “জেলেদের গান”। গ্রন্থভুক্তির সময় কবিতাটির নাম পরিবর্তন করে “ধীবরদের গান” রাখা হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

কবিতাটি সম্পর্কে পাদটীকা হিসেবে উক্ত পত্রিকায় “মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত কথাটি মুদ্রিত হয়েছে। ‘লাঙল’-এর ২৫শে চৈত্রের সংখ্যায় সর্বহারার কবিতাটি মুদ্রিত হয়। “সাম্যবাদী” কবিতা গুচ্ছ সহ “কৃষকের গান”, “শ্রমিকের গান”, “বীরদের গান” এবং “সর্বহারার” “সর্বহারার” (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ‘লাঙল’-এর মাত্র পনেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিলে ‘লাঙল’-এর শেষ সংখ্যার প্রকাশ ঘটে।^{২৪}

১৯২৬ সালের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারের আহবানে কৃষ্ণনগরে ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনো দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-সম্মেলনে দলের নতুন সভাপতি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) নির্বাচিত হন। এ-সম্মেলনে পত্রিকার নাম ‘লাঙল’-এর স্থলে ‘গণবাণী’ রাখা হয়। ‘গণবাণী’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে। সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয় মুজফ্ফর আহমদের উপর।^{২৫} এ-পত্রিকার সঙ্গেও নজরুলের যোগাযোগ ছিল, তবে সম্পাদক হিসেবে নয়, লেখক হিসেবে। ‘লাঙল’-এর মতো ‘গণবাণী’ও ক্ষণজীবী ছিল। ১৯২৭ সালের ২৭শে অক্টোবরের সংখ্যা (১ম বর্ষ-৩২শ সংখ্যা) প্রকাশের পর ‘গণবাণী’ বন্ধ হয়ে যায়।

পাঁচ

‘নবযুগ’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব যখন নজরুলের উপর আসে তখন তিনি একশ বছরের যুবক মাত্র। সে-সময়ে পত্রিকা-সম্পাদনার তাঁর তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে সঙ্গে ছিলেন তাঁর থেকে প্রায় দশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিবেদিত একজন অতি সজ্জন ব্যক্তি। ফলে পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের কৃষক-মজুর সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ‘নবযুগ’ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু নজরুল তাঁর প্রতিভার ওণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকা-সম্পাদনায় যে-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’তে তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার চরিত্র এমন ছিল যে, তা মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অতি সহজেই রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং নজরুল মধ্যবিত্ত তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে বীরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ‘লাঙল’ ছিল নির্যাতিত ও শোষিত কৃষক শ্রমিকদের কাগজ। তাই এ-কাগজের পরিচালনার ভার যখন নজরুল গ্রহণ করলেন, তখন মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক কর্মীরা সুখী হতে পারে নি। কারণ তাঁদের স্বার্থ ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। “ভূমি হতে পাওয়া আয় তাঁরা ভোগ করতেন, কিন্তু ভূমি হতে কোন উৎপাদন তাঁরা করতেন না, সেই কাজটি করতেন কৃষকেরা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মধ্যবিত্ত যুবকেরা অকাতরে জেল খাটতে পারতেন, প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারতেন, কিন্তু ভূমিতে ছিল তাঁদের স্বার্থ। আজকের অবস্থার সঙ্গে এই জিনিসটা বুঝতে চাইলে চলবে না। এটা বুঝতে হবে উনিশ শ বিশ্বের দশকের অবস্থাকে সামনে রেখে।”^{২৬}

সাহিত্যিকী

কিন্তু নজরুল এই মধ্যবিত্ত যুবকদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যে সমাজ ও পরিবার থেকে এসেছিলেন, তাতে তাঁর কোন পিছুটান ছিল না। তবু তিনি বামপন্থী রাজনীতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। তাঁর ছিল নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারা। তাই ‘দাঙল’ সম্পাদনাকালেও তিনি কমিউনিষ্ট হয়ে যান নি। এ-বিষয়ে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের (১৯০১-১৯৮১) মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য :

লাঙল-গণবাণীর সংশ্লেষ যাওয়ায় নজরুল সম্বন্ধে আমাদের মনে বেশ চাপ্তলোর সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা সবাই সশংকচিত্তে ভেবেছিলাম, হয়তো নজরুল কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা হয় নি। নজরুল চরিত্র কমিউনিষ্ট হবার উপযোগী ছিল না। নজরুল মানবতার কবি-বেদনার কবি। সাধারণ মানুষের জন্য, দুঃখী মানুষের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর অন্তরে যে মমতা, যে বেদনারোপ ছিল, তারই প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছিল লাঙল গণবাণীর সংশ্লেষে গিয়ে। কমিউনিষ্ট মতবাদকে তিনি আদৌ মেনে নিতে পারেন নি। তাই বেশিদিন তাঁকে এখানে দরে রাখা সম্ভবও হয়নি। বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য যে, মুজফ্ফর আহমদ সাহেব ছিলেন নজরুলের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয়াদিক আত্মীয়, আর সুখ-দুঃখে সমভাগী। বিশ্বমানবতার সেবক নজরুল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবান্বিত হয়েও তাই কমিউনিষ্ট হতে পারেননি।^{১৬}

নজরুল কবি হিসেবে সারাজীবন তাঁর স্বাভাবিক বজায় রেখেছিলেন। সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর এই স্বাভাবিক দূর্লভ্য নয়। এখানেই নজরুলের অনন্যতা।

তথ্যনির্দেশ

১. “আমার কৈফিয়ৎ”, ‘সর্বহারার’ (১৯২৬), নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৯২-৯৫।
২. মুজফ্ফর আহমদ, ‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৬৯, পৃ. ৭৬-৭৭।
৩. ঐ, পৃ. ৭৭।
৪. ঐ, পৃ. ১০৩।
৫. ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, ‘নজরুলের কবিতা : বাজেয়াপ্তির জন্য অনুবাদ’ ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১।
৬. ‘কাজী নজরুল’, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ১৭৭।
৭. আবুল মনসুর আহমদ, ‘আত্মকথা’, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৩৫০।
৮. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, ‘যুগস্রষ্টা নজরুল’, ঢাকা ১৯৫৭, পৃ. ২১১।
৯. ‘আত্মকথা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।
১০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ‘অতীত দিনের স্মৃতি’, ঢাকা ১৯৬৮, পৃ. ৮৯-৯০।
১১. ‘কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮।

কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা

১২. ঐ, পৃ. ৩০০-৩০১।
১৩. 'ধূমকেতু', ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, ১১ই আগস্ট, ১৯২২, পৃ. ১-১৬। আরো দ্রষ্টব্য, সারোয়ার জাহান, "নজরুল ও ধূমকেতু", 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ. ৯৩-১০২।
১৪. উদ্ধৃত, এস.এম.লুৎফর রহমান, "ধূমকেতুর প্রকাশ প্রসঙ্গে", 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ৫ম বর্ষ, গ্রীষ্ম ১৩৮৩, পৃ. ৪১।
১৫. 'ধূমকেতু', ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, পূর্বোক্ত। আরো দ্রষ্টব্য, মৃত্যাকা নূরউল ইসলাম, 'সমকালে নজরুল (১৯২০-১৯৫০)', ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ১০।
১৬. 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১; 'বল্লোল যুগ', চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৫৪, পৃ. ৪৬-৪৭, 'জ্যেষ্ঠের ঝড়', বিকাশ সংস্করণ, কলিকাতা ১৪০৫, পৃ. ৮৮; "ধূমকেতুর নজরুল", 'কবি নজরুল কলিকাতা ১৯৫৭; পৃ. ৩৬-৩৭; 'কাজী নজরুল', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭-৭৮।
১৭. 'সমকালে নজরুল', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
১৮. ঐ, পৃ. ২২-২৩।
১৯. 'যুগশ্রুতি নজরুল', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
২০. মুজফ্ফর আহমদ, 'আমার জীবন' ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, ১৯২০-১৯২৯, বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৩৯১-৯২।
২১. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৩৯৮-৯৯।
২২. মুজফ্ফর আহমদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১।
২৩. 'যাত্রী', পরিবর্তিত সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭৫, পৃ. ৮৫-৮৮।
২৪. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯।
২৫. মুজফ্ফর আহমদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩-৯৪।
২৬. মুজফ্ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯-১০।
২৭. 'যুগশ্রুতি নজরুল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।